মূর্তি বনাম ভাস্কর্য : সমকালীন বিতর্ক

[বাংলা]

الأصنام و منتجات الفن التشكيلي : تقييم للجدل الدائر بينهما

[اللغة البنغالية]

লেখক : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

تأليف : عبد الله شهيد عبد الرحمن

সম্পাদনা : আলী হাসান তাইয়েব

مراجعة : علي حسن طيب

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

islamhouse.com

মূর্তি বনাম ভাস্কর্য : সমকালীন বিতর্ক

একটি বিতর্ক : মূর্তি না ভাস্কর্য ?

বিমানবন্দর গোল চক্করে লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বাধার মুখে কর্তৃপক্ষ তা গত ১৫ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে সরিয়ে নেয়। এরপর এ নিয়ে সৃষ্টি হয় তুমুল বিতর্ক। কিছু লোক এটি পুনস্থাপনের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে। আবার অনেকে এখানে হজ মিনার নির্মাণের পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করে।

এদিকে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী বলছেন, 'বিমান বন্দর গোল চক্করে যা নির্মাণ করা হচ্ছিল ওটা মূর্তি নয়; ভাস্কর্য।' তারা 'মূর্তি' ও 'ভাস্কর্য'কে আলাদাভাবে সজ্ঞায়িত করতে চান। বুঝাতে চান দুটো এক জিনিস নয়। তাদের কথা, ইসলামে মূর্তি নিষিদ্ধ হলেও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ নয়।

এ বিষয়টি আলোচনা করতে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হবে :

আভিধানিক অর্থে ভাস্কর্য :

ভাস্কর্য অর্থ : Sculpture (স্কালপচার)। যে আকৃতি বা ছবি খোদাই করে তৈরি করা হয় তা-ই ভাস্কর্য। যেমন বলা হয় 'ভাস্কর্য বিদ্যা' এর অর্থ, The art of carving বা খোদাই বিদ্যা। যিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছেন তাকে বলা হয় ভাস্কর (Sculptor) অর্থাৎ যিনি খোদাই করে আকৃতি বা ছবি নির্মাণ করেন। যেমন আছে অক্সফোর্ড অভিধানে– One who carves images or figures.অর্থাৎ যে ছবি অথবা আকৃতি খোদাই করে তৈরি করে। পক্ষান্তরে মূর্তি অর্থ ছায়া বা এমন আকৃতি-শরীর, যার ছায়া আছে।

ভাস্কর্য ও মূর্তির আভিধানিক অর্থে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেল। এককথায় যে সকল আকৃতি খোদাই করে তৈরি করা হয় তা ভাস্কর্য– রৌদ্র বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া পড়ে না। আর যে সকল আকৃতি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, রৌদ্রে বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া প্রকাশ পায়, তা হল মূর্তি। বিভিন্ন অভিধানে এভাবেই বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, যে আকৃতিটা বিমান বন্দর গোল চক্করে নির্মাণ করা হচ্ছিল, এ সংজ্ঞার বিচারে তা কি ভাস্কর্য- যেমনটি বলেছেন এর পক্ষের পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীগণ- না মূর্তি- যেমনটি মনে করেছে মাদরাসার মূর্খ (?) অবুঝ ছাত্ররা?

যারা সেটি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজ চোখে কিংবা ছবিতে, তারা সকলেই দেখেছেন যে, ওটা এমন আকৃতি যার ছায়া আছে। এবং সেটি কোন কিছুর ওপর খোদাই করে নির্মাণ করা হয়নি। কাজেই বুঝা যাচ্ছে আভিধানিক অর্থে সেটি মূর্তি ছিল; ভাস্কর্য নয়।

এখন প্রশ্ন হল, যে সকল পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী বলেছেন ওটা মূর্তি নয়; ভাস্কর্য তারা কী ভুল করেছেন? কীভাবে ভুল করবেন? তারা বিমান বন্দরের আশেপাশে অবস্থিত মাদ্রাসার ছাত্রদের থেকে অভিধানে বিষয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞ তা বলাই বাহুল্য। (বুদ্ধিজীবীদের ধারণায়) এরা অভিধান দেখে কি-না তাতে সন্দেহ আছে পক্ষান্তরে তারা অভিধান শুধু ঘাঁটেনই না রচনাও করেন।

আমি এর উত্তর খুঁজতে চেয়ে যা বুঝেছি তা হল

এক. সম্ভবত বুদ্ধিজীবীরা ওখানে নির্মিতব্য লালনের আকৃতিটা দেখেননি। তারা মতলববাজ মিডিয়ায় প্রচারিত 'ভাস্কর্য' শব্দটি শুনে মনে করেছেন সত্যিই ওটা ভাস্কর্য– যা কোনো দেয়ালে বা স্থাপনায় খোদাই করে নির্মাণ করা হচ্ছিল।

দুই. তারা মনে করেছেন, যদিও ওটা আভিধানিক অর্থে মূর্তি; ভাস্কর্য নয়। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে ভাস্কর্য। তারা মনে করেছেন, যে সকল আকৃতি পূজা অর্চনার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে মূর্তি বলে। আর যা পূজার জন্য নয়, তার নাম ভাস্কর্য।

তিন. তারা খুব ভাল করেই জানেন যে, ভাস্কর্য ও মূর্তির মধ্যে আভিধানিক পার্থক্য কী? কিন্তু তারা ওটা নির্মাণের পক্ষে। আর মাদ্রাসার ছাত্ররা যেহেতু এদুয়ের মধ্যকার পার্থক্য বুঝে না, তাই সহজেই তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে। বিশ্বাস করানো যাবে যে ওটি আসলে মূর্তি নয়। কাজেই এ নিয়ে তোমাদের প্রতিবাদ বা আন্দোলন করার কিছু নেই। তোমাদের এ আন্দোলন নিছক অর্বাচীনতা বৈ কিছুই নয়।

প্রথম উত্তরের জবাবে বলা যায়, যদি তারা নির্মিতব্য লালন আকৃতিটি না দেখে থাকেন, তাহলে তাদের এ বিষয়ে ফতোয়া দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। কোনো বিষয়ে মতামত দিতে হলে ভালভাবে জেনে বুঝে নিতে হয়। এ কথায় তারা ভিন্নমত পোষণ করবেন বলে মনে করি না।

দ্বিতীয় উত্তরের জবাবে বলতে চাই, আপনারা যেমন মনে করেছেন যে, পারিভাষিক অর্থে, যে আকৃতির পূজা করা হয় সেটি মূর্তি। আর যার পূজা করা হয় না সেটি ভাস্কর্য। আপনাদের এ ব্যাখ্যা কোথাও প্রচলিত নয়। যা প্রচলিত নয়, তা কখনো পারিভাষিক অর্থ বলে গণ্য হয় না। বরং ছায়া আছে এমন সকল আকৃতিকে মূর্তি বলে মানুষ জানে ও জানায়। যেমন আমরা দেখেছি যখন লেলিনের

দেহটি টেনে নামানো হল, তখন সকলে বলেছে 'লেলিনের মূর্তি ..' এমনিভাবে যখন সাদ্দামের আকৃতি টেনে নামানো হল, তখন সকলে বলল, 'সাদ্দামের মূর্তি নামিয়ে ফেলা হয়েছে।' তখন কেউ ভাস্কর্য বলেছে বলে শুনিনি। এমনিভাবে লোকে বলে ফেরআউনের মূর্তি, আব্রাহাম লিঙ্কনের মূর্তি ইত্যাদি। এ দুটো উদাহরণে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ওই আকৃতিগুলোর ছায়া ছিল ও খোদাই করে নির্মিত নয় বলে ওগুলো মূর্তি। আর ওগুলো পূজার জন্য স্থাপন করা হয়নি, তবু তা মূর্তি। অতএব দেখা গেল, ভাস্কর্য ও মূর্তির আভিধানিক অর্থই পারিভাষিক অর্থ হিসাবে প্রচলিত। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। পূজার জন্য হলেও মূর্তি, পূজার জন্য না হলেও মূর্তি। এখানে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের জ্ঞানের দৈন্যতার আরেকটি প্রকাশ! তাদের প্রতি করুণা হয়!

তৃতীয় উত্তরের জবাবে বলব, অন্যকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা কোনো নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না। যারা মানুষকে জ্ঞান দিতে চান তাদের থেকে এ ধরনের আচরণ জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

কাজেই বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে যে সকল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকে ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দেয়া একটি মূর্খতা, একটি কাপুরুষতা, একটি কপটতা। উদ্দেশ্য হল, ভাস্কর্য শিল্পের নামে ইসলামি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং অন্ধকার যুগের পৌত্তলিক সংস্কৃতি-কে বাঙালীর সংস্কৃতি বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

এক বুদ্ধিজীবীর ফতোয়া

প্রিন্ট মিডিয়াতে এ বিষয়ে অনেক বুদ্ধিজীবীর ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। আমি এর মধ্য থেকে বহুল পঠিত একটি প্রবন্ধের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি– তিনি 'এখন কোথায় যাব কার কাছে যাব' শিরোনামে লিখেছেন,

'আমাদের মহানবী (সা.) কাবা শরিফের ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বললেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে। যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজী (সা.) সেখানে হাত রাখলেন এবং বললেন, এই ছবিটা তোমরা নষ্ট করো না। কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অসীম মমতা থেকে। মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগে কাবা শরিফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিল, এতে কাবা শরিফের পবিত্রতা ও শালীনতা ক্ষুণ্ন হয়নি। (মহানবীর (সা.) প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের (আরব ইহিহাসবিদ, জন্ম : ৭০৪ খৃষ্টাব্দ মদিনা, মৃত্যু : ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ) লেখা দি লাইফ অব মোহাম্মদ গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বললাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম (প্রকাশকাল ২০০৬ পৃ. ৫৫২)।

আমরা সবাই জানি, হজরত আয়েশা (রা.) নয় বছর বয়সে নবীজীর (সা.) সহধর্মিণী হন। তিনি পুতুল নিয়ে খেলতেন। নবীজীর তাতে কোনো আপত্তি ছিল না, বরং তিনিও মজা পেতেন এবং কৌতূহল প্রদর্শন করতেন। (মুহাম্মদ আলী আল–সাবুনী, রাওযাইউল বয়ন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩) ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হজরত ওমর (রা.) জেরুজালেম জয় করেন। প্রাণীর ছবিসহ একটি ধুপদানি তাঁর হাতে আসে। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নব্বীতে ব্যবহারের জন্য আদেশ দেন। (আব্দুল বাছির, ইসলাম ও ভাস্কর্য শিল্প : বিরোধ ও সমন্বয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ পত্রিকা, জুলাই ২০০৫, জুন ২০০৬)

পারস্যের কবি শেখ সাদীকে কি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু আছে? উনি হচ্ছেন সেই মানুষ যার নাত এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মিলাদে সব সময় পাঠ করে থাকেন। মাদ্রাসার উত্তেজিত বালকেরা শুনলে হয়তো মন খারাপ করবে যে, শেখ সাদীর মাজারের সামনেই তার একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা তা ভাঙেনি। ইসলামের দুজন মহান সুফিসাধক, যাঁদের বাস ছিল পারস্যে (বর্তমান ইরান) এঁদের একজনের নাম জালালুদ্দীন রুমি। অন্যজন ফরিদউদ্দীন আত্তার (নিশাপুর)। তাঁর মাজারের সামনেও তাঁর আবক্ষমূর্তি আছে। (বরফ ও বিপ্লবের দেশে, ড. আবদুস সবুর খান, সহকারী অধ্যাপক, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।) কঠিন ইসলামিক দেশের একটির নাম লিবিয়া। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বিশাল একটা মসজিদ আছে। মসজিদের সামনেই গ্রিকদের তৈরি একটি মূর্তি স্বমহিমায় শোভা পাচ্ছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা মূর্তিটা ভেঙে ফেলেনি।

বিগত ২৭ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে লেখাটি ছাপা হয়।

এ লেখা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি আর কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি :

১. যদি ইবনে ইসহাকের বর্ণিত তথ্য সত্য হয়ে থাকে তাহলে জানার ইচ্ছা জাগে, যে ছবিটি রাসূল সা. রেখে দিলেন সেটি কোথায় গেল? কোনো মাদ্রাসার ছাত্র সেটা নষ্ট করে দিল? মুসলমানগণ ইবনে ইসহাকের তথ্য গ্রহণ করবেন, না আল্লাহর রাসূল সা. এর নির্দেশ মেনে চলবেন?

২. আয়েশা রা. যখন পুতুল নিয়ে খেলতেন তখন তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। তখন ইসলামি অনুশাসন তাঁর ওপর বর্তায়নি বলে রাসূল সা. তাঁকে পুতুল খেলতে নিষেধ করেননি। কিন্তু যখন বয়স্ক হলেন, তখন সামান্য ছবিও তাকে রাখতে নিষেধ করেছেন। আয়েশা রা. এর মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেছেন, রাসূল সা. একদিন সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি একটি পর্দা টানিয়েছিলাম। যাতে খুদে প্রাণীর ছবি ছিল। রাসূল সা. যখন এটা দেখলেন, ক্রোধে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তার হবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য নির্মাণ করে।' অতপর আমি সেটাকে টুকরো করে একটি বা দুটি বালিশ বানালাম।

৩. উমর রা. ধুপদানিটি মসজিদে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন প্রাণীর ছবিটি প্রদর্শনের জন্য নয়। ধুপদানিটি ধুপ দানের কাজে ব্যবহারের জন্য। প্রাণীর ছবি অস্পষ্ট থাকলে এ ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করতে সমস্যা নেই।

৪. শেখ সাদি, রুমি, আত্তারের কবরে যে সকল মূর্তি আছে সেগুলো তারা নিজেরা স্থাপন করেননি। করার জন্য কাউকে নির্দেশও দিয়ে যাননি।

৫. রুমি ও আত্তারের কবরে স্থাপিত আকৃতিকে লেখক 'মূর্তি ' বলে উল্লেখ করেছেন। লিবিয়াতে স্থাপিত আকৃতিকে মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। ভাস্কর্য বলেননি। এতে প্রমাণিত হল, যা পূজা করা হয় না, এমন আকৃতিকেও মূর্তি বলা হয়। শুধু সাধারণ মানুষেরা নয়, লেখকের মত বড় বড় পণ্ডিত ও ভাষাবিদরাও বলেন।

৬. বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে সকল মূর্তি স্থাপিত আছে, সেগুলো তাদের সমস্যা। দায় তাদের। এর সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক? ইসলামের সম্পর্ক আল্লাহর বাণী ও রাসূলের আদর্শের সাথে। কুরআন ও সুন্নাহতে যা পাওয়া যাবে সেটা ইসলাম বলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনো মুসলমানের আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম ইসলাম নয়। যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

৭. কোথাও কোনো বিষয় দেখলেই সেটা অনুসরণযোগ্য মনে করা বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনার পরিপন্থী। অনুসরণ করতে হলে দেখতে হবে এটা ইসলামে অনুমোদিত কিনা। ইসলামে যদি অনুমোদিত না হয়, তবে মক্কা শরিফের ইমাম সাহেব করলেও গ্রহণযোগ্য হবে না। মক্কার বড় ইমাম সাহেব কাবা ঘরে ভাস্কর্য নির্মাণ করলেও তা মিটিয়ে দিতে হবে। রাসূল সা. কাবার মূর্তি অপসারণের সময় নবী ইবরাহিম আ. ও নবী ইসমাঈল এর মূর্তিগুলোকেও রেহাই দেননি। এ বিষয়টি বুখারিসহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৮. শ্রদ্ধেয় লেখক প্রবন্ধটি লিখতে যে গবেষণা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। সাথে সাথে তাকে বলতে মনে চায়, এ সকল বিষয়ে আমেরিকান বই পত্র পড়ার সাথে সাথে কোনো ইসলামিক স্কলারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আল-কুরআন ও হাদিস অধ্যায়ন করা উচিত। আর যদি মনে করেন, এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার মত ইসলামিক স্কলার দেশে নেই, তাহলে কর্তব্য হবে, নিজে কুরআন ও হাদিস শিখে নিয়ে সেই দায়িত্বটা পালন করা।

ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদিকে ইসলাম দু'ভাগে ভাগ করে। এক. প্রাণীর ছবি। দুই. প্রাণহীন বস্তুর ছবি। প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তৈরি করা যাবে না। প্রদর্শন করা যাবে না। স্থাপন করা যাবে না। হাদিসে এসেছে– আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল' সা. একদিন সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি একটি পর্দা টানিয়েছিলাম। যাতে প্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি ছিল। রাসূল সা. যখন এটা দেখলেন, ক্রোধে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা, কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তার হবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য নির্মাণ করে।' অতপর আমি সেটাকে টুকরো করে একটি বা দুটি বালিশ বানালাম।

আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. আমাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, 'কোনো প্রতিকৃতি রাখবে না। সবগুলো ভেঙে দেবে। আর কোনো উঁচু কবর রাখবে না। সবগুলো সমতল করে দেবে।'

আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রতিকৃতি আছে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' (বুখারি, মুসলিম)

প্রাণী ব্যতীত যে কোনো বস্তুই হোক তার ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদি অঙ্কন, নির্মাণ, স্থাপন ও প্রদর্শন করা যাবে। কারণ, হাদিসে যে সকল নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে তার সবই ছিল প্রাণীর ছবি বিষয়ে। কেউ যদি কোনো ফুল, ফল, গাছ, নদী, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, ঝর্ণা, জাহাজ, বিমান, গাড়ি, যুদ্ধাস্ত্র, ব্যবহারিক আসবাব-পত্র, কলম, বই ইত্যাদির ভাস্কর্য তৈরি করে সেটা ইসলামে অনুমোদিত।

ভাস্কর্য-মূর্তি সম্পর্কে ইসলাম কঠোর কেন ?

যতগুলো পৌত্তলিকতা বিরোধী ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচে' বেশি সোচ্চার। পৌত্তলিকতা মানে এক কথায় বলা যায়, মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি মারাত্মক অবিচার।

ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়। তাঁর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তা অন্যকে প্রদান। তাঁর প্রাপ্য উপাসনা অন্যকে নিবেদন করা। অবশ্য যারা ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল যাদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের কাছে পৌত্তলিকতা আর একত্ববাদ কোনো বিষয় নয়। এটা কোনো আলোচ্য বিষয় হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। তারা আমার এ কথাগুলো থেকে কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না।

ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য আর মূর্তিকে ইসলাম পৌত্তলিকতার প্রধান উপকরণ মনে করে। শুধু মনে করা নয়, তার ইতিহাস, অভিজ্ঞতা স্পষ্ট। শুধু ইসলাম ধর্ম যে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে তা নয়। বরং আরো দুটি একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছেও তা ঘৃণিত। আর এ পৌত্তলিকতার সূচনা হয়েছিল ছবি বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে।

BwZnvmUv G iKgÑ Av`g Av. Gi P‡j hvIqvi A‡bK c‡ii NUbv| ZLb mKj gvbyl wQj ZvIwn`cš'x| GK Avj-vni cÖfyZ¡ I Dcvmbvq wek¦vmx| †m mgv‡Ri cuvP Rb AZ¨š— RbwcÖq mr gvbyl gviv †Mj| mgv‡Ri †jv‡Kiv †kv‡K G‡Kev‡i †f‡O coj| me©`v Zv‡`i Av‡jvPbv I Zv‡`i Rb¨ †kvK cÖKvk Ki‡Z _vKj| kqZvb G cwiw¯'wZi my‡hvM wbj| †m GKRb e„× gvby‡li AvK…wZ‡Z Zv‡`i Kv‡Q G‡m ejj, hviv P‡j †M‡Qb Zviv Lye fvj gvbyl wQ‡jb| †Zvgiv K‡qKw`b c‡i Zv‡`i‡K fy‡j hv‡e| GKUv KvR Kiv hvq, Avwg Zv‡`i Qwe Gu‡K †`B| Zviv †hLv‡b emevm KiZ †Zvgiv Qwe¸‡jv †mLv‡b Uvwb‡q ivL‡e| Zvn‡j †Zvgiv I †Zvgv‡`i cieZ©xiv Zv‡`i fy‡j hv‡e bv| mgv‡Ri †jv‡Kiv Zv‡Z m¤§Z nj| Zviv ejj, my›`i cÖ¯—vel G Qwei gva¨‡g Avgiv c~e©cyi"l‡`i ¯§i‡Y ivLe| kqZvb cuvP R‡bi Qwe A¼b K‡i w`j| Zviv Zv‡`i emev‡mi ¯'v‡b Uvbvj| G cÖRb¥ P‡j †M‡j cieZ©x cÖRb¥ Avmj| Zviv Qwe¸‡jv‡K DbœZ I AwaKZi ¯'vqx Kivi j‡¶¨ †m¸‡jv‡K g~wZ©‡Z i*f*cvš—i Kij| wKš' Zviv G¸‡jvi c~Rv ev Dcvmbv KiZ bv| G cÖRb¥ P‡j †Mj| Avmj cieZ©x cÖRb¥| Zviv G‡m G g~wZ©¸‡jvi cÖwZ kÖ×v wb‡e`b Ki‡Z _vKj| Gici Ab¨ cÖRb¥ G‡m mivmwi G¸‡jvi Dcvmbv ïi" K‡i w`j| G nj gvbe mgv‡R g~wZ© c~Rv, †cŠËwjKZv I wki‡Ki m~Pbvi BwZnvm| (Zvdwm‡i Be‡b Kvwmi, eyLvwi : Zvdwmi Aa¨vq)

এ ইতিহাসে আমরা দেখতে পেলাম মূর্তিগুলো যারা নির্মাণ করেছিল তারা কিন্তু উপাসনার উদ্দেশ্যে করেনি। এমনিভাবে যারা ছবি অঙ্কন ও টানিয়ে রাখার অনুমোদন দিয়েছিল, তারাও পূজা করার নিয়ত করেনি। কিন্তু শয়তান তাদের এ কাজটিকে তাদের কাছে সুশোভিত করেছে।

ছবি ও ভাস্কর্যের পথ ধরেই যুগে যুগে পৌত্তলিকতার আগমন ঘটেছে। আর এ পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তাওহিদের আলোতে নিয়ে আসার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আজীবন তাঁরা এ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। অনেকে জীবন দিয়েছেন। অনেকে দেশ থেকে বিতারিত হয়েছেন। এ জন্যই ইসলাম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার। মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করা তাদের ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যদি পূজা উপাসনার জন্য মূর্তি নির্মিত না হয় তবুও ?

অনেকেই ফতোয়া দিয়ে বসেন, এ ছবি, এ প্রতিকৃতি, এ ভাস্কর্যতো পূজার জন্য নয়। এতে দোষের কী? দোষের কিছু আছে কিনা তা জানতে প্রশ্ন করা দরকার, আপনি ছবিটা কেন টানাবেন, অর্থ, শ্রম, সময় ও মেধা খরচ করে ভাস্কর্যটা কেন নির্মাণ করবেন? এর উত্তর হতে পারে একাধিক। যেমন–

(ক) মূর্তিটি যার বা প্রতিকৃতিটি যার, তাকে স্মরণীয় করে রাখতে এ কাজটি আমরা করে থাকি। ভাল কথা, সে ভাল মানুষ, তাকে স্মরণীয় করে রাখা হোক এটা ইসলাম অনুসারীরাও চায়। কিন্তু তাকে স্মরণীয় করে রাখতে এ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি আছে কিনা? যদি বিকল্প থাকে, তাহলে যা ইসলাম পছন্দ করে না এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে আমরা বাধ্য কেন? কে আমাদের বাধ্য করে? কে আমাদের প্ররোচিত করে?

এ পদ্ধতিতে তাকে স্মরণীয় করে রাখতে অন্য মানুষের কোনো কল্যাণ আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে আমরা এমন অনর্থক কাজ কেন করব যা মৃত মানুষকে কোনো কল্যাণ দেয় না। যা জীবিত মানুষের কোনো উপকারে আসে না? তার নামে একটি হাসপাতাল, একটি ইয়াতিমখানা, একটি নলকূপ, একটি রাস্তা, একটি স্কুল নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করেও তাকে স্মরণীয় করে রাখা যায়। এতে তারও কল্যাণ, আর অন্যান্য মানুষেরও কল্যাণ। এ ভাল পদ্ধতি বাদ দিয়ে আমরা খারাপ পদ্ধতি গ্রহণ করব কার নির্দেশে?

(খ) মূর্তিটি যার তাকে সম্মান ও ভালোবাসা জানাতে তার ভাস্কর্য নির্মাণ করে থাকি। ভাল কথা, তার প্রতি সম্মান জানাতে ইসলাম অনুসারীরাও চায়। কিন্তু এ সম্মানের পদ্ধতিটা ইসলাম বিরোধী হতে হবে কেন? সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা এমন পদ্ধতিতে হওয়া দরকার যাতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এতে অংশ নিতে পারে। আর মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হল মূর্তি পূজা। যারা মূর্তিকে পূজা করে, তারাও তো এ সাকার মূর্তির মাধ্যমে অনুপস্থিত সত্তার সম্মান করে। মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনতো একটি বিশেষ ধর্মীয় রীতি।

যদি বলা হয়, আসলে মূর্তির প্রতি আমাদের সম্মান নয়। শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়। তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা নেই। বরং এটা হল যার মূর্তি তারই জন্য। তাহলে বলব, যে মূর্তির প্রতি আপনাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, ভালোবাসা নেই, কেউ সে মূর্তিটা ভাঙ্গতে চাইলে আপনাদের ব্যথা লাগে কেন? এ ব্যথা লাগার অনুভূতিই প্রমাণ করে আসলে আপনাদের ভালোবাসা ও সম্মান মূর্তির জন্য নিবেদিত। এটাই তো স্পষ্ট মূর্তিপূজা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কত বড় মূর্খতা ও জাহেলিয়াত। একটি মূর্তি যা মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না বরং পরোক্ষভাবে অকল্যাণই করে, তার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে জীবিত, সমাজে সমাদৃত মানুষগুলোকে অপমান করা হয়। এর চেয়ে মূর্তি পূজার বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

ইবরাহিম আ. তার পিতা ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এ মূর্তিগুলোর সামনে অবস্থান কর কেন?' তারা বলল, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের এ রকম করতে দেখেছি।' ইবরাহিম বলল, 'যদি তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে থাকে তবুও তাদের অনুসরণ করবে?' (আম্বিয়া : ৫২-৫৪)

যারা এখন এগুলো করে তাদের কাছে এ কাজের সমর্থনে এর চেয়ে ভাল কোনো জওয়াব নেই।

(গ) বলা হতে পারে মূর্তির প্রতি সম্মান বা ভালোবাসা প্রদর্শন উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল আমাদের জাতীয় পরিচয়, দেশজ সংস্কৃতি তুলে ধরা। ভাল কথা, জাতীয় পরিচয়, দেশজ সংস্কৃতি তুলে ধরতে সকল জাতির ও সব দেশের লোকেরাই চায়। এটা দেশ প্রেম সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি মূর্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে এটা কোন সংস্কৃতির প্রকাশ। আমাদের সংস্কৃতিতে মূর্তি গড়ার সংস্কৃতি কোথায়? এটা ভারতের সংস্কৃতি হতে পারে বাংলাদেশের নয়। কাজেই যা আমাদের নয়, তা আমাদের বলে চালিয়ে দেয়া তো অন্যায় কাজ। আলোচিত লালন মূর্তির নির্মাতা মৃণাল হককে বিবিসি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ওটা নির্মাণ করতে বিমান বন্দর চত্বর কেন বেছে নিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'বাহির থেকে মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করেই যেন আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়। এ জন্য ওই স্থানটিকে বেছে নেয়া।'

কত চমৎকার জওয়াব! বাহির থেকে মানুষ এসেই যেন ধারণা করে বাংলাদেশি সমাজ ও সংস্কৃতি হল একটি পৌত্তলিক সংস্কৃতি। এরা শুধু একতারা দোতারা সেতারা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মৃণালের কথায় প্রমাণ, এটা ছিল বাংলাদেশি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

কিন্তু তারা এতটুকু ভাবল না, এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষ যতবার এটা দেখবে ততবার অভিশাপ দেবে। এ স্থান থেকে হাজার হাজার হজ যাত্রী পৌত্তলিকতা ও মূর্তি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে মূর্তিমুক্ত পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে হজ করতে যায়, উমরা করতে যায়। আবার এ পথেই ফিরে আসে। এটি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে মারাত্মকভাবে।

একটি ভাস্কর্য যতই সুন্দর হোক, তা যদি ইসলামি সংস্কৃতির কোনো পরিচয় বহন করে তাহলে তা ভারত বা আমেরিকা তাদের দেশের উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করতে দেবে না। তারা বলবে, 'এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' বাংলাদেশে কেন এমন ভাস্কর্য স্থাপিত হবে, যা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে? যা একশ ভাগই একটি পৌত্তলিক গোষ্ঠীর সংস্কৃতির অংশ।

বলা হচ্ছে, ইরানে মূর্তি আছে, ইরাকে আছে, লিবিয়াতে মূর্তি আছে, ইন্দোনেশিয়াতে মূর্তি আছে। আরো অনেক মুসলিম দেশে আছে। তাহলে আমাদের দেশে থাকলে ক্ষতি কী? ভাল কথা। মুসলিম দেশে কোনো খারাপ বস্তু থাকলে সেটা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কোনো ভাল বিষয় থাকলে তা গ্রহণ করা যায় না?! অনেক মুসলিম দেশে শরিয়া আইন চালু আছে। আছে ইসলামি পারিবারিক আদালত আছে। কিংবা সেখানে সুদি কারবার নিষিদ্ধ। অনেক মুসলিম দেশে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। অথচ মুসলিম দেশে যদি ইসলাম পরিপন্থী কিছু থাকে তাহলে সেটা আমাদের অনুসরণ করতে হবে! আপনাদের ব্যাপারে কী তাহলে আল্লাহর সে বাণীই প্রযোজ্য, যেখানে তিনি বলেছেন– 'তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর ভ্রান্ত পথ দেখলে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল অমনোযোগী।' (নিসা : ১১৫) ■

সমাপ্ত